লেখিকার কথা

একদিন শুনলাম আমার লেখার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, লেখার মাঝে অজান্তেই রম্য চলে আসে। কথাটা শুনে মনে হলো আসলেই তো, কেন লেখার মাঝে এত রম্যের ঘনঘটা! সাহিত্যের এত ঘরানা থাকতে রম্য লিখতে এত আরাম পাই কেন?

এখানে সম্ভবত বড় ভূমিকা পালন করেছেন আমার আব্বা। শৈশবে তার মুখে খুব শুনতাম আবুল মনসুর আহমেদের কথা। *আদু ভাই* কিংবা *গালিভারের সফরনামা* থেকে লাইনের পর লাইন আব্বা অনর্গল মুখস্থ বলে যেতেন। কখনো শুনে বুঝতাম না কোন বিষয়টা হাসির, কখনো বুঝতাম। এভাবে সময় যেতে যেতে রম্যটা কোন জায়গায় ধরতে অসুবিধা হয়নি। বড় হয়ে চিন্তার পরিধি বাড়ল। আবিষ্কার করলাম *আদু ভাই* হাসির নয়; কষ্টের গল্প। অথচ পড়তে গেলে হাসি পাবেই। ইংরেজ আমলে সপ্তম শ্রেণি থেকে হুট করে ইংরেজি মিডিয়াম শুরু হতো বলে পাশ করা ভীষণ সংগ্রামের ব্যাপার ছিল। সেই সংগ্রামের গল্পটাই হাসিঠাট্টার মোড়কে অবলীলায় বলে গেছেন আবুল মনসুর আহমেদ।

সেই থেকে আমার উপলব্ধি—কঠিন কথা, তিক্ত কথা, তথাকথিত সুশীল সমাজে অভদ্র কিন্তু প্রয়োজনীয় কথা বলার একমাত্র হাতিয়ার হলো—রম্য।

পাঠ্যবই পড়ার বেলায় তেমন সুবিধে করতে পারিনি, বাইরের বইয়ের বেলায়ও তেমনই। তাই বড় মুখ করে বলতেও পারি না অমুক তমুক লেখকের গল্প-উপন্যাস পড়ে রম্য লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। দুই-একটা মুজতবা আলীর রচনা, শীর্ষেন্দুর কিশোর উপন্যাসের পাতায় পাতায় হাস্যরস আমাকে বিনোদন দিয়েছে বটে, কিন্তু তাদের থেকে রম্য শিখেছি বলতে যতটা পণ্ডিত হওয়া লাগে, ততটা আমি নই। শিখতে গেলেও যোগ্যতা লাগে, সেই যোগ্যতা হয়নি বলেই মনে করি। আমি এতই

কম পড়েছি যে, পরিবারের সবাই যখন কোনো সাহিত্য নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করত, আমিও মিনমিন করে কিছু বলতে নিলে সবাই সন্দেহের চোখে তাকাত। আসলেই কি বইটা আমি পড়েছি!

অবশ্য কম কম পড়েছি বলেই বিশাল একটা ফাঁকা মাথা আছে আমার। সেই ফাঁকা মাথায় অনেক গল্প ঘুরঘুর করে। তার কিয়দংশ নিজের মতো করে লিখে ফেলেছি, লোকে বলেছে রম্য হয়েছে। আমিও খুশিমনে মেনে নিয়েছি।

আসলেই সেগুলো রম্য হয়েছে কি না সেই ভার পাঠকের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলাম।

আফিফা আবেদীন সাওদা

সূচিপত্র

ম্যাটিনি শো	৯
ভার্চুয়াল আমলনামা	১৬
ফেমিনিস্ট আতঙ্ক	২২
মিসকিন সমাচার	২৮
প্রতিচ্ছবি	৩৪
যে ভুলে সেলিব্রিটি হলাম	৩৮
মতির মালা	৪৪
বোন, একটু ভেবে দেখবেন কি	৪৭
ইউ নো, ম্যারিকাতে এমনটা হয় না	৫২
শিকারি	৫৫
মারেফতি স্বামী বশীকরণ	৫৮
আজ শুভ্রর ঈদ	৬৬
প্রশ্নপত্র ফাঁস	৭১
মানুষ সামাজিক জীব	৭৬
কান বাড়িয়ে দিন	৮০

ম্যাটিনি শো

[এক]

'শেষবারের মতো বলছি, আমার সাথে চল। গোঁয়ারতুমি করিস না।'

ভেবেছিলাম আনোয়ার ভাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু না, তিনি হাল ছাড়েননি। শেষ চেস্টা করতে আমার বাসায় এসে উপস্থিত।

'রেজা, কয়দিন আর রিটায়ার্ড বাবার ঘাড়ে বসে খাবি? কাজ শুরু কর। গতর খাট।'

ভাই এবার ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করছেন। সব সহ্য হয়, বাপের ঘাড়ে বসে খাওয়ার খোঁটা সহ্য হয় না। চাকরি কম খুঁজিনি। জুতার তলা ক্ষয়ে গেছে সেই ভার্সিটিতে পড়ার সময়েই। ছয় বছর ধরে এক জুতা পরলে যা হয় আর কি। সেসময় ফটোগ্রাফির ওপর একটা কোর্স করেছিলাম। আনোয়ার ভাইয়ের সাথে পরিচয়ও সেই সূত্রে। আনোয়ার ভাই এখন ওয়েডিং ফটোগ্রাফার। ফেসবুকে একটা পেইজ খুলে বসেছেন, নাম 'ইন্টিমেট ক্লিক'। এত দিন বন্ধু বান্ধবের বিয়ের ছবি তুলতেন। সম্প্রতি সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন 'ইন্টিমেট ক্লিকের' ফটোগ্রাফি দেখে যারপরনাই মুগ্ধ। তার বৌভাত আর হানিমুনের ছবি তুলে দিতে হবে। কাজটা প্রোফেশনাল হওয়া চাই। এজন্যই আমাকে এত জোরাজুরি। আনোয়ার ভাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে হবে।

ভাই আমাকে রাজি করাতে ধাপে ধাপে এগুচ্ছেন। এত দিন বলতেন কাজটা নিলে তার উপকার হয়। এখন বলছেন কাজটা করলে আমারই উপকার। পরবর্তী ধাপে তিনি বোঝালেন এত দিন ধরে আমার যা যা উপকার তিনি করেছেন, তার প্রতিদান দেবার এখনই সময়। উপকারীর উপকার স্বীকার করলেই হবে না, পালটা উপকার করে শুধিতে হইবে ঋণ। কে জানে, তার বেঁধে দেওয়া সীমারেখায় আজীবনও চলতে হতে পারে। অগত্যা আমি হয়ে গেলাম ওয়েডিং ফটোগ্রাফারের অ্যাসিস্ট্যান্ট।

অনেক বছর হলো কোনো বিয়েতে যাই না। গিয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড। স্কুলের পোশাকের মতো একইরকম পোশাক পরে সবাই খুশিমনে ঘুরঘুর করছে। সবার হাতে ফোন। যে যার মতো সেলফি তুলছে। আলাদাভাবে ফটোগ্রাফারের কাজ কী বুঝতে পারছিলাম না। বুঝতে পারলাম একটু পরে। নানান ভঙ্গিমায় বর কনের একলা অথবা যুগল ছবি তুলতে ফটোগ্রাফার প্রয়োজন। আরও ভালোমতো বুঝলাম নায়িকা থুক্কু কনের রোষানলে পরে।

আনোয়ার ভাই বলছিলেন কনের মাথার ওড়না টা তার নাকের সাপেক্ষে অপ্রতিসম হয়ে গেছে, আমি যেন ঠিক করে দিই। এক অপরিচিতার ওড়না ঠিক করে দেব! মা-বাবার শেখানো সভ্যতা ভব্যতার কথা মাথায় রেখে নায়িকাকে গিয়ে বললাম, 'আপা ওড়নাটা ঠিক করেন।'

ব্যস! তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। প্রথমে নায়িকা চ্যাঁচাচ্ছিলেন আমি কে তাকে ওড়না ঠিক করতে বলার? পরে যখন জানতে পারলেন আমি ফটোগ্রাফারের অ্যাসিস্ট্যান্ট, তখন চ্যাঁচামেচি অন্যদিকে মোড় নিল। আমরা কেন এত অনভিজ্ঞ? কনের ওড়না তো ঠিক করব আমি। সে কি ক্যামেরার এঙ্গেল বোঝে? আমাদেরকে টাকা দিয়ে ভাড়া করা হয়নি?

কথা উঠলে অনেক রকম কথাই উঠে। ফটোগ্রাফারের গুষ্টি উদ্ধার শেষে নায়িকা তার চামার স্বামীর গুষ্টি উদ্ধার করল। সে নাকি কিপটামি করে এমন গাঁইয়া ফটোগ্রাফার এনেছে।

আনোয়ার ভাই আমাকে চোখের দৃষ্টিতে, মুখের বাণীতে বেশ কয়েকবার ভস্ম করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছেন। আমি বোবা, বধির হয়ে উপকারীর অপকার না করার চেষ্টায় আছি। উপকারীর অপকার করে যে, তাকে কৃতঘ্ন বলা হয়। এত কঠিন উপাধিতে ভূষিত হওয়া যাবে না।

অবশ্য একটু পর আবারও কেলেঙ্কারি বাধিয়ে ফেললাম। এবার অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। বর মহাশয় কোথায়, কীভাবে কোন দৃষ্টিতে কনের দিকে তাকাবে তা বুঝিয়ে দিতে হবে। ছবিটা এমন হবে যেন কনে অসীমপানে চেয়ে বসে আছে। অদূরে বর ফুলের তোড়ার আড়াল থেকে প্রেমময় দৃষ্টিতে বউকে দেখছে। বিষয়টা ভালোমতো বোঝাতে গিয়ে বরকে বললাম, 'সোজা কথা হলো আপনি চোরের মতো উঁকি মেরে নিজের বউকে দেখবেন, আর আনোয়ার ভাই ক্যামেরার লেন্সে জুম করে দেখবে।'

আর যায় কই! বরের দাবি, আমার কথা বলার ধরন অতিশয় আপত্তিকর। অশালীনও বটে। বড় আশা করে সে আনোয়ার ভাইকে এনেছিল, তার জানা ছিল না আমার মতো খাটাশ তার অ্যাসিস্ট্যান্ট।

[দুই]

আমরা এখন সেন্ট মার্টিনে। বর কনের সাথে হানিমুনে এসেছি। বৌভাত কেলেঙ্কারির পর ভেবেছিলাম আমাদেরকে আর ডাকা হবে না। কিন্তু না, বর বেচারা অসহায়। ধারদেনা করে বিয়ের জন্য খরচ যা করেছেন, তাতে আর কুলোচ্ছে না। সস্তা ফটোগ্রাফার চাই।

তাই আর্ত মানবতার সেবায় আনোয়ার ভাই এবং আমি সেন্ট মার্টিনে সিনেমার শ্যুটিং করতে হাজির। শুধু বর না, আনোয়ার ভাইও আমাকে ছাড়া অসহায়। নইলে কবেই বিদায় করে দিত। সকলের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ইতিমধ্যে নায়ক নায়িকার সাথে আমার কয়েকবার সংঘর্ষ হয়ে গেছে। প্রথমটা ইচ্ছাকৃত। আমাকে খাটাশ বলে অভিহিত করায় প্রতিশোধ নিতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সকালের নাস্তায় দেখলাম দুজনের প্লেটে দুইটা কাটলেট, তবু তারা এক কাটলেট দুজন মিলে খাচ্ছে। একজন আরেকজনকে খাইয়ে দিচ্ছে। আমার আর আনোয়ার ভাইয়ের নাস্তা সাদামাটা, কোনো কাটলেট দেওয়া হয়নি। কাটলেট দিলে বিল বেশি আসত। শুরু থেকেই এমন বৈষম্য চলে আসছে। নায়ক নায়িকা ঢাকা থেকে এসি বাসে রওনা দিয়েছিল, আর আমাদেরকে দিয়েছিল নন এসি বাসের টিকেট।

অবশ্য এসবে কোনো সমস্যা ছিলো না। বন্ধ এসি বাসে বমি আসে আমার। নন এসি বাসই সই। কাটলেটও আমার মা বানায়। জীবনে অনেক খেয়েছি। কিন্তু মাথাটা গরম হয়ে গেল যখন নায়িকা ন্যাকা ন্যাকা গলায় আমাকে বলল একজন আরেকজনকে খাইয়ে দেওয়ার ছবি তুলে দিতে হবে।

আমরাও খাচ্ছি। সবজি দিয়ে পরোটা। হাতে পরোটার তেল, সবজির ঝোল। খাবার ফেলে রেখে এখন তাদের ছবি তুলতে হবে। দিলাম তুলে। এরপর নায়িকার প্লেটের আস্ত কাটলেটটা নিয়ে নিজের টেবিলে বসে খাওয়া শুরু করলাম।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই স্তব্ধ। আমিই কেবল চাকুম চাকুম করে কাটলেট খেয়ে যাচ্ছি। খাওয়া শেষে বললাম, 'দুজন যখন একটা কাটলেটই ভাগাভাগি করে খাবেন, তো দুইটা অর্ডার করেছেন কেন? আজ আমি না খেলে তো নষ্ট হতো।'

নায়িকা রাগে ফোঁসফোঁস করে অনেক কিছুই বলেছে, নায়কও বলেছে, বলতে বাকি রাখেনি আনোয়ার ভাইও। তবে আমি কানে তুলিনি। আমি জানি এখানে সবাই অসহায়।

দুপুরে খাওয়ার পর ঘটল আরেক কাণ্ড। নায়িকার শখ হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী,

ভার্চুয়াল আমলনামা

[এক]

ক্লাসি শাকিলা চিন্তিত মুখে স্মার্টফোনটা একবার নামিয়ে রাখছেন, আরেকবার হাতে তুলে নিচ্ছেন। তার নাম আসলে শাকিলা শারমিন। তবে ফেসবুকে তাকে সবাই ক্লাসি শাকিলা নামে চেনে। দীর্ঘ ১৫ বছরের ফেসবুক জীবনে ক্লাসি আপু শুনতে শুনতে মনেই থাকে না ক্লাসি তার নামের অংশ নয়।

শাকিলা বসে আছেন এক বিশেষ মেনশনের অপেক্ষায়। ফেসবুকে তাকে অনেকেই মেনশন করত, এখনও করে। কত শত পোস্ট লেখেন, সেসব কপি পেস্ট করে লোকে নাম মেনশন করে দেয়। অনেকে আবার প্রতিযোগিতায় জিততে যত্রতত্র ট্যাগ, মেনশন দিয়ে ঝালাপালাও করে দেয়। কিন্তু আজকের মেনশনটা অন্যরকম। ক্লাসি শাকিলা অপেক্ষা করছেন কখন তার বেয়াইন জাগ্রত রিনিতা তাকে মেনশন করবেন।

আজ অনেক দিন পর তিনি নিজ হাতে রান্না করেছেন। চাইনিজ সবজি। বক্স ভরে পাঠিয়ে দিয়েছেন বেয়াইন জাগ্রত রিনিতার বাড়িতে। ১০ বছর আগে কোনো এক স্ট্যাটাসে রিনিতা চাইনিজ সবজির ছবি দিয়ে লিখেছিল 'মাই লাভ'। বেয়াইনকে খুশি করতে এক বক্স পাঠাতেই পারেন তিনি।

'লাভ ফ্রম বেয়াইন' ক্যাপশনের একটা ছবি এখন সময়ের দাবি। কিন্তু দাবি পূরণ হচ্ছে কই! কোনো নোটিফিকেশনই আসছে না। দীর্ঘ এক ঘন্টা অপেক্ষার পর শাকিলা ভাবলেন রিনিতার প্রোফাইলে ঢু মেরে আসি।

ঢু না মারলেই বুঝি ভালো হতো। রিনিতা তার ১০ বছর আগের 'মাই লাভ' চাইনিজ সবজির ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'আচ্ছা, এখানে কি কোথাও লেখা

আছে—তেল, লবণ ছাড়া সবজি ভর্তা আমার প্রিয়?'

মনটা তেতো হয়ে গেছে শাকিলার। রিনিতার সাথে আত্মীয়তা করার আগে অনেকেই বলেছিল এত জজবাধারীর সাথে ছেলে বিয়ে দিয়ো না। ফেসবুকে তার পোস্টের যে ঝাঁঝ, কাঁদানে গ্যাসেও নাকি অত ঝাঁঝ নেই। শাকিলা পাত্তা দেননি।

প্যারেন্টিং নিয়ে লেখালেখি করতেন রিনিতা। বাচ্চাকে মারবেন না। বাচ্চাকে টিকা দিন। বাচ্চা কাউকে দেখে চিৎকার দিলে তার টুঁটি চেপে ধরুন। এরকম অনেক টিপস শাকিলার বেশ কাজে লেগেছিল ছেলেকে মানুষ করতে। দুই বেয়াইন বলতে গেলে একইসাথে ফেসবুকে বেড়ে উঠেছেন।

সেই টুঁটি চেপে ধরা পোস্টটার কথা আজও মনে পড়ে। কী ঝগড়াই না হয়েছিল! হুট করে একদল হাজির হয়ে বলল, বাচ্চারা মাঝে মাঝে ফলস অ্যালার্ম দেয়। চিৎকারের সাথে সাথেই কারও টুঁটি চেপে ধরা বাড়াবাড়ি। এটা নাকি গুড প্যারেন্টিং না। সবচেয়ে বেশি ঝামেলা করেছিলেন এক ভদ্রলোক। তার ছেলে নাকি তাকে দেখলেই কোলে ওঠার জন্য চিৎকার দেয়। রিনিতার পোস্টটা আপলোড হওয়ার পরদিন ছেলে কোলে ওঠার জন্য চিৎকার দিয়েছিল। অমনি ভদ্রলোকের বউ তার টুঁটি চেপে ধরে। অনেক দিন গলার ব্যথায় তিনি কথা বলতে পারেননি। তাতে কী! কিবোর্ড যুদ্ধে জাগ্রত রিনিতার গুষ্টি উদ্ধার করে ছেড়েছেন তিনি।

সেসময় রিনিতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শাকিলা। বাচ্চারা নিষ্পাপ, ওরা মিথ্যেমিথ্যি চিৎকার দিতেই পারে না। নিশ্চয়ই লোকটার কোনো অপরাধ ছিল। ফেসবুকে এমন অনেকেই আছেন নিজের অপরাধ লুকিয়ে অন্যকে ভুল প্রমাণ করে। শাকিলার উচ্চমার্গীয় এলিট সব পোস্টের কারণে সে যাত্রায় রিনিতা বেঁচে যান। অনেকেই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে ভদ্রলোকই অপরাধী।

সেদিনের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর প্রতিদান বুঝি আজ পেলেন শাকিলা। অনেক হয়েছে আর না। তিতকুটে মন নিয়ে স্ট্যাটাস দিলেন, 'খাবার নিয়ে মন্তব্য না করা নবিজির সুন্নাহ। আমরা কয়জনে এই সুন্নাহ মানি? ও আচ্ছা, সুন্নাহ মানার সময় কই! আমাদের সময় তো যায় ঝাঁঝালো সব পোস্ট দিয়ে!'

পোস্ট দেওয়ার এক সেকেন্ডের মাথায় ২০টা লাইক আর পাঁচটা শেয়ারে উত্তেজিত স্নায়ু কিছুটা শিথিল হলো।

তবে একটা কমেন্টে গা কেমন চিড়বিড় করে উঠল। এক ভদ্রলোক লিখেছেন, 'ভাবি, কোনো সমস্যা? আপনারা দুই বেয়াইন খাবার নিয়ে পোস্ট দিলেন যে!'

[দুই]

'তোমার বেয়াইনের কীর্তি দেখেছ?'

ক্লাসি শাকিলার রাগ এখনও কমেনি। অফিস থেকে স্বামী রিবেলিয়াস জাহিদ ফিরতেই অভিযোগনামা দাখিল করে বসলেন।

'কই তেমন কিছু তো দেখিনি! ও আচ্ছা, ফেসবুকে সবজি ভর্তা নিয়ে কী যেন বলেছেন...।'

'এটা তেমন কিছু না? এরপর তুমি আমার স্ট্যাটাস দেখোনি? দেখোনি আমি নবিজির সুন্নাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছি?'

জাহিদ তখন মোজা খুলে জুতো জোড়া শেলফে রেখেছেন মাত্র। ঘরের হালচাল এখনও বুঝতে পারছেন না। কোন কথা বললে কোন বিপদ ঘাড়ে এসে পড়ে আঁচ করাও শক্ত।

'কী হলো? কথা বলছ না কেন?'

'অ্যাঁ? সুন্নাহ নিয়ে পোস্ট দিয়েছ? ভালোই তো করেছ! এমনটাই তো হওয়া উচিত!'

'এই দাঁড়াও...দাঁড়াও! তুমি তোমার বেয়াইনের পোস্ট ঠিকই পড়ো। আর আমার লেখায় রাজ্যের অনীহা, তাই না?'

ব্যস! হামলাটা এইদিক থেকে আসবে তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি জাহিদ। দুই যুগের বিবাহিত জীবনে তিনি শুধু হিসাব করেই গেলেন, কোন কথাটা বললে বোমা বর্ষণ হবে না। কিন্তু হিসাব শেষে যেই কথাটাই বলেছেন, সেখানেই বিপদে পড়েছেন। ফেসবুকের বজ্রকণ্ঠী রিবেলিয়াস আজ বোতাম আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান। ছেলে বিয়ে দিয়ে পরিবার বর্ধিত করার পর তার বিপদ আরও বেড়েছে। ভেবেছিলেন ক্লাসি শাকিলার প্রিয় মুখ জাগ্রত রিনিতার মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে করালে অন্তত দুই বেয়াইনের চুলোচুলি হবে না।

অথচ দিন যতই যাচ্ছে রিবেলিয়াস জাহিদ দেখছেন তারা একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারছেন না। আজ তো বিস্ফোরণ হয়েই গেল। দুজনের প্যারেন্টহুড নিয়ে লেখালেখি একজনকে আরেকজনের কাছে এনেছিল। আজ বেয়াইনহুড নিয়ে কোনো লেখা নেই বলে দুজনের এত ঝামেলা। ইদানীং একজন লিখছে কী করে আদর্শ মেয়ের মা হওয়া যায়, আরেকজন লিখছে পুত্রবধূর শাশুড়ি হওয়ার আদব।

রিবেলিয়াস জাহিদ আগের ফেসবুক আইডি ডিলিট করে রিলিজিয়াস জাহিদ নামে

মিসকিন সমাচার

[এক]

রফিক সাহেব খবরের কাগজ মুখের সামনে মেলে ধরে বারান্দায় বসে আছেন। এটা আসলে খবরের কাগজ না, এটা একটা প্রটেক্টর শিল্ড। আবেগ আর নৈতিকতার মাঝে টানাপোড়েন শুরু হলে এভাবে খবরের কাগজ মুখের ওপর ধরে রাখতে হয়।

রফিক সাহেবের স্ত্রী সেলিনা বেগম রান্নাঘর থেকে পুরো বাড়ি নিয়ন্ত্রণ করেন। ঘরের এখানে সেখানে গুপ্তচর নিয়োগ দেওয়া আছে। বারান্দায় যে এক বিশাল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চলছে তা তার অজানা নয়। তার একমাত্র মেয়ে শায়লা সকাল সকাল বাবাকে ফোন দিয়েছিল। সেই পুরানো কাসুন্দি। শায়লার শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুক চায়। বিয়েতে কিছু দেওয়া হয়নি বলে এখনও খোঁটা দেয়। শারীরিক আঘাত করে কি না এ ব্যাপারে শায়লা নীরব। ও এখন আর বাবার পাহাড় সমান নীতি নৈতিকতা নিয়ে গর্ব করতে পারে না। পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে অবশ্য বলাই যায় 'আই অ্যাম প্রাউড অব মাই বাব্বাহ!'

কিন্তু এখন পরিস্থিতি প্রতিকূলে। বাবা-ভাইদের অর্থকড়ি যা আছে তাতে খুব সহজে শ্বশুরবাড়ির মুখে কুলুপ এঁটে দেওয়া যায়। বাপের বাড়ি কুলুপ এঁটে দিতে আগ্রহী না! তার বাবা সততার পরাকাষ্ঠা, ন্যায়ের বিমূর্ত প্রতীক!

শায়লা রফিক সাহেবকে ফোন করলেই বলেন, 'ব্যাগ গুছিয়ে চলে এসো মা। আমি এখনও বেঁচে আছি। যে বাড়িতে যৌতুকের জন্য অত্যাচার করে সে বাড়িতে থাকতে হবে না।'

আজও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মেয়ে ফোন রেখে দিয়েছে। রফিক সাহেব পেপারটা নাকের ওপর ঠেসে ধরে আছেন। এভাবে কোনো কিছু পড়া সম্ভব নয়। স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম সীমা ২৫ সেন্টিমিটার। কিন্তু তিনি তো পেপার পড়তে

চাইছেন না। আগেই বলা হয়েছে এটা এক ধরনের প্রোটেক্টর শিল্ড। আবেগ আর নৈতিকতার টানাপোড়েন গোপন রাখার শিল্ড।

অবশ্য সবই বৃথা চেষ্টা। সেলিনা বেগমের কানে ঠিক ঠিক খবর পৌঁছে গেছে। তথ্যসূত্র : বড় নাতি।

নাতির নাম মুসা। আট বছরের মুসা একাই ঘরের সিংহভাগ তথ্য পাচার করে থাকে। ওর কান বেশ পরিষ্কার। ফোনের ওপাশ থেকে ফুপি দাদাকে কী বলেছে তাও শুনেছে।

ফুপি বলেছে, 'বাবা তুমি আমার সংসার ভাঙতে চাইছ? তুমি কি মানুষ? তোমার মনে দয়ামায়া নেই?'

মুসা তার দাদা আর ফুপির ওপর বেশ ক্ষিপ্ত। এই দুজনের কথায় কোনো নতুনত্ব নেই। রোজ রোজ একই কথা।

দাদা বলেন, 'চলে এসো।'

ফুপি বলে, 'আমি কি আমার বাবা-ভাইদের কাছে এতটুকুও আশা করতে পারি না?'

মুসা খেয়াল করে দেখেছে তার একমাত্র ফুপি শায়লা বড়ই গন্ডগোলপ্রবণ মহিলা। গত বছর পালিয়ে বিয়ে করল। প্রেমের বিয়ে। দাদা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলে ফেললেন। ঘরের শোকেসের দিকে তাকিয়ে চ্যাঁচালেন, 'তোকে পড়ালেখা করিয়ে পাপ করেছি! আমার ভুল হয়েছে! আমাকে একবার মুখ ফুটে বললে আমি নিজে বিয়ের ব্যবস্থা করতাম। তুই পালালি কেন?'

মুসা অবাক। ফুপি পালিয়ে গেছে। আর দাদা শোকেসকে বকা দিচ্ছে! তবে একটা কথা তার ভীষণ মনে ধরেছিল। দাদা পড়ালেখা করিয়ে পাপ করেছে। ওর ভীষণ ইচ্ছে করছিল দাদাকে গিয়ে বলতে, 'দাদা, আমারও মনে হয় পড়ালেখা করা পাপ। আমি আর পড়তে চাই না।'

মুসা অবশ্য এ কথা বলার মতো অত বোকা না। সে যে সবার কথা চুপচাপ গিলে যায় এটা জানান দেওয়া যাবে না। ও সবার ঘরে কার্পেট কিংবা টেবিল ল্যাম্পের মতন জড়বস্তুর অভিনয় করে। কান নেই, মুখ নেই, চোখ নেই এমন একটা ভাব ধরে বসে থাকলেই বড়রা একসময় মুসার অস্তিত্ব টের পায় না আর। ফুপি যে প্রেম করে এটাও সে জানত। দুই একবার ব্ল্যাকমেইলও করেছিল। ফুপি গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ইনকাম ভালোই। তাকে ব্ল্যাকমেইল করে এটা ওটা হাতিয়ে নেওয়া দোষের কিছু না।

এই এক বিয়েকে কেন্দ্র করে প্রচুর নাটক হয়েছিল বাসায়। সব ঘটনা সবাই জানে না, তবে মুসা অনেকটা জানে। অনেকের চাইতে বেশিই জানে। মুসার মাকে শায়লা ফুপি বলেছে, 'ভাবি, আমাদের বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়িতে যৌতুক ছাড়া বিয়ে হয় না। আমি এজন্যই পালিয়ে বিয়ে করেছি। পারিবারিকভাবে বিয়ে করলে বাবা-ভাইদের কাড়ি কাড়ি টাকা নষ্ট হতো। আমি চাইনি এমনটা হোক।'

আসলে ঘটনা অন্যরকম। ছেলের মা-বাবা গ্রামের এক মেয়েকে বিয়ের জন্য ঠিক করে এনেছিল। গাঁইয়া মেয়েকে বিয়ে করতে হবে এই ভয়ে ছেলে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রেমিকাকে বিয়ে করে ফেলেছে।

এ ঘটনা কেবল মুসা জানে। এ বাড়ির আর কেউ জানে না। বাড়ির এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গল্প মুসার পেটে খলবল করে। সব গল্প সুখকর না। বেশিরভাগ গল্পই ভীষণ বাজে।

বাড়ির সবার ওপর মুসার অনেক রাগ। ছুটাবুয়া মর্জিনা খালা রেগে গেলে আপনমনে গজগজ করে 'সবটিরে থাবড় দেওনের কাম! মাইরা সুজা কইরা ফালানির কাম!'

মুসারও অমন করে বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বলা যাবে না। অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা নিষেধ। তার ওপর সে যে জানে সবটিরে থাবড় দিতে হবে, এ তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে বিপদ।

[দুই]

শায়লা বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদছে। উপুড় হয়ে শোয়া নিষেধ, বাবা দেখলে ধমক দিত। এ বাসায় বাবা নেই। মা-ও নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর আর স্বামী আছে। দেবর কারও সাতে পাঁচে নেই। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। শ্বশুর-শাশুড়ি উঠতে বসতে কথা শোনায়। বিয়ের পর রেহানও বেশ বদলে গেছে। মা-বাবার অন্যায়ে কোনো প্রতিবাদ নেই। পালিয়ে বিয়ে করার খেসারত বেশ ভালোভাবেই দিচ্ছে শায়লা।

এ বাড়ির কর্ত্রী অত্যন্ত কঠিন মহিলা। তার ছেলেরা এমনকি স্বামীও তার কথায় উঠবস করে। তার ইচ্ছে ছিল নিজ গ্রামের সহজ সরল ইন্টার পাশ মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে দেবেন। বেশি পড়ালেখা করা মেয়েকে সামলানো কঠিন। একটু উনিশ-বিশ হলে, হালকা চড়-চাপড়েই মামলা করে দিতে পারে। তার ওপর গ্রামের যে মেয়েটাকে পছন্দ করেছিলেন, সেই মেয়েকে পোষ মানানোর নানান উপায় তার জানা আছে। শহুরে মেয়ের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়। মেয়ের বাবা মাও বেশ অবস্থাসম্পন্ন ছিল। উপঢৌকন ভালোই আসত। ওই মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়া গেল কই! ছেলে তার স্বপ্ন ভেঙেচুরে শায়লাকে বিয়ে করে ফেলল। এখন তাই সকাল সন্ধ্যা যতক্ষণ শায়লাকে বাগে পাচ্ছেন ততক্ষণ খোঁটা দিয়ে যাচ্ছেন। ছেলের